52

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 08 SEP 1994
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

প্রাথমিক ও মৌলিক শিক্ষা ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক উদ্যোগ এবং বাংলাদেশ

এ কে এম আনিসুর রহমান
যুগ্ম-সচিব
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ

একবিংশ শতাব্দীর দ্বারপ্রান্তে মানব সমাজ উপনীত। শান্তি ও সমৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে গোটা বিশ্ব সমাজ এখন খুব কাছাকাছি। শান্তি স্থাপনে, মানুষের কল্যাণে, দারিদ্রের অভিশাপ থেকে জনগোষ্ঠীকে মুক্ত করার লক্ষ্যে মানব সম্পদ উন্নয়ন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব পাচ্ছে। এটা অনস্বীকার্য যে, মানব সম্পদ উন্নয়নে প্রধান শর্তই হচ্ছে নিরক্ষরতা থেকে মানুষের মুক্তি। প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর আগে মানবাধিকারের উপর বিশ্ব ঘোষণায় স্পষ্টভাবে উচ্চারিত হয় যে, বিশ্বের প্রতিটি মানুষেরই শিক্ষার অধিকার আছে। ১৯৯০ সনের ৫ থেকে ৯ মার্চ পর্যন্ত থাইল্যান্ডের জমতিয়েনে ২০০০ সাল নাগাদ সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সবার জন্য শিক্ষা শীর্ষক বিশ্ব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে ১৫৫টি দেশের শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রায় ১,৫০০ জন নীতি নির্ধারক, বিশেষজ্ঞ, সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। প্রত্যেক ব্যক্তির অর্থাৎ শিশু, কিশোর, কিশোরী এবং বয়স্ক পুরুষ ও মহিলার জন্য "মৌলিক শিখন চাহিদা" মিটানো সবার জন্য শিক্ষার বিশ্ব ঘোষণার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল।

২। সবার জন্য শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হলো সকল শিশু, কিশোর, কিশোরী ও প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ ও মহিলা লিখতে, পড়তে, বলতে এবং সাধারণ হিসাব রাখার মত ক্ষমতা অর্জন করতে পারবে, অর্জিত জ্ঞান, দক্ষতা এবং মূল্যবোধ সম্পর্কে সচেতন হবে, মেধা ও সৃজনশীলতার প্রয়োগ, উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে পারার ক্ষমতা, উন্নত জীবন-যাপন ও স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নেয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে পারবে।

৩। বিশ্ব সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী দেশ সমূহ বিশ্ব ঘোষণায় ২০০০ সাল নাগাদ সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিতকরণের দৃঢ় অংগীকার ব্যক্ত করে। বিশ্ব সম্মেলনে অন্যতম অংশগ্রহণকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশও সবার জন্য শিক্ষার বিশ্ব ঘোষণার প্রতি অঙ্গীকারাবদ্ধ। ১৯৯০ সনের সেপ্টেম্বর মাসে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে শিশু অধিকার বিষয়ে এক বিশ্ব শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ সহ ১৬১টি সদস্য রাষ্ট্র কর্তৃক অনুমোদিত ৫৪টি ধারা সম্বলিত "জাতিসংঘ শিশু অধিকার কনভেনশনে" প্রত্যেক শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা লাভের অধিকারের বিষয়টি স্পষ্টভাবে পুনর্ব্যক্ত করা হয়। 'সবার জন্য শিক্ষা' নিশ্চিততকরণের জন্য আন্তর্জাতিক উদ্যোগের সাথে বাংলাদেশও শরীক হয়েছে।

৪। ১৯৯৩ সনের ১৬ই ডিসেম্বর ভারতের নয়াদিল্লীতে 'সবার জন্য শিক্ষা' বিষয়ে পৃথিবীর নয়টি অধিক জনসংখ্যা অধ্যুষিত দেশের শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। দেশগুলো হচ্ছে বাংলাদেশ, ব্রাজিল, চীন, মিশর, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, মেক্সিকো, নাইজেরিয়া ও পাকিস্তান। জমতিয়েনে সবার জন্য শিক্ষা বিষয়ক বিশ্ব ঘোষণার আলোকে এ দেশগুলো একত্রে বসে ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকল্পনার নীতি ও কৌশল নির্ধারণ করেছে। সবার জন্য শিক্ষার দিল্লী ঘোষণা সর্বসম্মত-ভাবে গৃহীত হয় এবং ভবিষ্যৎ কার্যক্রমের একটি রূপরেখা প্রণয়ন করা হয়।

অধিক জনসংখ্যা অধ্যুষিত এই নয়টি দেশে বিশ্বের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক এবং বিশ্বের মোট নিরক্ষরের শতকরা ৭০ ভাগ লোক বাস করে। এসব দেশের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও জাতিসত্তার ভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও একটি বিষয়ে এসব দেশ এক বাক্যে স্বীকার করেছে যে, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে ও উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখার জন্য শিক্ষাই হচ্ছে একমাত্র উপায়। শিক্ষা শুধু মৌলিক মানবিক অধিকারই নিশ্চিত করে না, জনসংখ্যা বিস্ফোরণ রোধ, অধিক উৎপাদন ও অধিকতর সহনশীল, শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক সমাজ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ কারণে দিল্লী ঘোষণার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বজনীন এবং শিশু, যুবক ও বয়স্কদের জন্য এ'শতাব্দীর মধ্যেই শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ করে দিতে হবে।

৫। বাংলাদেশে ৭+ বয়সী জনসংখ্যার প্রায় সাড়ে পাঁচ কোটি লোক হচ্ছে নিরক্ষর, সেখানে মৌলিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থাপনার বিষয়টি নিঃসন্দেহে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশে দারিদ্র দূরীকরণ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য প্রথমতঃ মানবসম্পদ উন্নয়ন করা প্রয়োজন। একথা অনস্বীকার্য যে শিক্ষা ছাড়া মানবসম্পদ উন্নয়ন সম্ভব নয়। দেশের ভাষা, সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে যে সমৃদ্ধ ঐতিহ্য রয়েছে, তার মর্ম উপলব্ধি ও ঐতিহ্যের ধারাকে প্রবাহমান করার জন্য মৌলিক শিক্ষার বিস্তার অপরিহার্য।

৬। বাংলাদেশের সংবিধানে শিক্ষাপ্রসঙ্গে উল্লেখ রয়েছে যে, একই পদ্ধতির গণমুখী ও সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা, নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত আইনের দ্বারা সকল বালক বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতা-মূলক শিক্ষাদান এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব।

৭। বাংলাদেশ সরকার ১৯৯০ সালের বিশ্ব শিক্ষা সম্মেলনে ঘোষণা ও শিশু উন্নয়নের জন্য বিশ্ব শীর্ষ সম্মেলনের লক্ষ্যমাত্রাসমূহ নির্ধারণে অংশগ্রহণ ও বাস্তবায়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। উক্ত সম্মেলন দু'টিতে সরকার ২০০০ সাল নাগাদ সবার জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করার অংগীকার প্রদানের প্রেক্ষিতে প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীর হার ৯৫%, বিদ্যালয় সমাপনী হার ৭০%, এবং বয়স্ক সাক্ষরতার হার ৬২% এ উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

৮। বাংলাদেশের বিরাজমান আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে সবার জন্য মৌলিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেচনায় আনা হয়েছে ঃ

ক) বিদ্যমান প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, শিক্ষাক্রম, সম্পদের প্রাপ্যতা, চিরাচরিত শিক্ষাদান ব্যবস্থা বিশাল নিরক্ষর জনগোষ্ঠীর তুলনায় অপ্রতুল। সুতরাং জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সংগতি রেখে মৌলিক শিক্ষা বিস্তারে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন বলিষ্ঠ নেতৃত্ব, দৃঢ় অংগীকার ও সুদূর প্রসারী দৃষ্টিভংগী।

খ) দেশের প্রত্যেক শিশু, যুবক ও বয়স্ক ব্যক্তিরা যাতে মৌলিক শিক্ষায় শিক্ষিত হতে পারে সেজন্য শিক্ষাদানের ক্ষেত্র সম্প্রসারিত করতে হবে। সমাজে মেয়েদের শিক্ষা গ্রহণে যেসব প্রতিবন্ধকতা আছে, তা' দূর করতে হবে। মেয়েদের শিক্ষিতের হার বাড়াতে না পারলে এবং তাদের শিক্ষা ক্ষেত্রে সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে না পারলে, সবার জন্য শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। শিক্ষায় বৈষম্য থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। ভূমিহীন, সহায় সম্বলহীন খেটে খাওয়া শিশু, প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের শিশু, যুবক ও বয়স্ক ব্যক্তি, ভাষাগত ও ধর্মীয় সংখ্যা লঘু, উপজাতি-সবার জন্য একইরূপ শিক্ষার সুযোগ দিতে হবে। প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ শিক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন।

গ) শিক্ষাদানের পরিমাণগত দিকটির দিকে শুধু গুরুত্ব দেয়া যথেষ্ট নয়। শিক্ষার গুণগত দিকটিকেও সম গুরুত্ব দিতে হবে। জীবন ভিত্তিক শিক্ষাক্রম চালু না করলে একজন সাক্ষর ব্যক্তি তার বাস্তব জীবনে স্বনির্ভরতা অর্জন করতে পারে না। বিদ্যালয়ে ভর্তির সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, নিয়মিত শিক্ষার্থীরা উপস্থিত হচ্ছে, কোর্স সম্পূর্ণ করছে এগুলোর প্রয়োজন আছে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু একজন শিক্ষার্থী শেখার বিষয়বস্তুর কি পরিমান আত্মস্থ করতে পেরেছে এবং জীবনের সামগ্রিক কর্মকাণ্ডে এ শিক্ষা কি পরিমান সহায়ক হতে পারে তা' গভীরভাবে বিবেচনা করতে হবে।

৯। বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রধানতম স্তম্ভ। ৬ থেকে ১০ বছর বয়সী শিশুর শিক্ষা নিশ্চিতকরণের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা (বাধ্যতামূলক করা) আইন প্রবর্তন করা হয়েছে এবং ১৯৯২ সাল থেকে ৬৪টি জেলার ৬৮টি থানায় প্রথম পর্যায় হিসেবে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী চালু করা হয়। ১৯৯৩ সনে তা দেশব্যাপী চালু করা হয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শিশুদের মধ্যে শতকরা ৮৬ ভাগ বিদ্যালয়ে যাচ্ছে। বিদ্যালয় ত্যাগের বার্ষিক হার বর্তমানে ১০% এ নেমে এসেছে।

১০। ইতোমধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে, যেসব প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবকাঠামো উন্নয়ন, স্বল্প ব্যয়ে সেটেলাইট ও কম্যুনিটি স্কুল নির্মাণ, যুগোপযোগী শিক্ষাক্রম প্রণয়ন, সকল পর্যায়ে তদারকী ও পরিদর্শন কার্যক্রম জোরদারকরণ, প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা বাস্তবমুখীকরণ ইত্যাদি। এছাড়া বিদ্যালয়ের ভর্তি ও উপস্থিতির হার বৃদ্ধি, বিদ্যালয় ত্যাগের হার রোধ করার লক্ষ্যে নির্বাচিত এলাকায় শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে।

১১। সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করে শিক্ষার প্রতি আগ্রহী করে তুলতে হবে। সেই উদ্দেশ্যে সকল গণমাধ্যমে ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা, জনসমাবেশ, মহা সমাবেশে, ছাত্র ব্রিগেড গঠনের মাধ্যমে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। অভিভাবক ও শিক্ষক ছাড়াও জেলা, থানা এবং ওয়ার্ড পর্যায় পর্যন্ত বিভিন্ন কমিটি গঠনের মাধ্যমে বিভিন্ন স্তরের নাগরিককে শিক্ষার সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

১২। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ধারার সঙ্গে যারা যুক্ত হতে পারেনি, তাদেরকে শিক্ষার সুযোগ দেয়ার জন্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। প্রাথমিক ভাবে সমন্বিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তার কার্যক্রম নামক একটি পরীক্ষামূলক প্রকল্পের মাধ্যমে কর্মসূচী হাতে নেয়া হয়েছে। কর্মসূচীর উদ্দেশ্য হচ্ছে নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে সাক্ষর দান করা। বর্তমানে বয়োঃক্রম ভিত্তিক ৪টি স্তরে অর্থাৎ প্রাক-প্রাথমিক, মৌলিক, কিশোর-কিশোরী, ও বয়স্ক নর-নারীদের সাক্ষরতা দান করা হচ্ছে এবং নব্য সাক্ষরদের জন্য অব্যাহত শিক্ষার ব্যবস্থাও রয়েছে। এই প্রকল্পের মেয়াদ ১৯৯৫ সালের ডিসেম্বর মাসে শেষ হবে। ১৯৯৬ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাদান কর্মসূচী সারা দেশে বিস্তৃত করা হবে।

পরীক্ষামূলক প্রকল্পের অধীনে সমন্বিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তার কার্যক্রম উদ্দীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সাফল্য লাভ করেছে। এই গুলি হচ্ছে- (ক) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার অবকাঠামো গঠন, (খ) শিক্ষা উপকরণ উদ্ভাবন ও মুদ্রণ, (গ) অব্যাহত শিক্ষা কার্যক্রম চালু করার জন্য গ্রাম শিক্ষা মিলন কেন্দ্র স্থাপন, (ঘ) দক্ষ জনবল সৃষ্টি ও (ঙ) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা অর্জন। উল্লেখিত কার্যক্রম ও কর্মসূচীর ভিত্তিতে ২০০০ সালের মধ্যে সাক্ষরতা দান করার অভীষ্ট সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।